

প্রান্তজনের রুদ্ধ-সঙ্গীত : প্রসঙ্গ মুণ্ডা জনগোষ্ঠী

অরুণ ঘোষ

গোড়ার কথা

ভারতে আগত আর্যদের সকলেই ধর্মে ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈদিক প্রথানুসারী ছিলেন না। এঁদের মধ্যে যাঁরা বৈদিক প্রথানুসারী ছিলেন তাঁরা উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উত্তর পঞ্জাবে বসত গড়লেন, তাঁরাই বৈদিক সংস্কৃতির নির্দিষ্ট চেহারা গড়ে তুললেন। মধ্যদেশ পরিণত হল বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। পূর্ব দিকে অগ্রসরমান অবৈদিক আর্যরা ধর্মীয় রীতিনীতি ও অন্যান্য সংস্কারে, এমন কি ভাষায়ও বৈদিক আর্যদের থেকে আলাদা ছিল বলেই অনুমান করা যায়। প্রাথমিক পর্বে উত্তর ভারত থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে অবৈদিক আর্যদের বিস্তার। এই অঞ্চল তখন অনার্য, বিশেষত কোল, দ্রাবিড় অধ্যুষিত ছিল বলেই সুনীতিকুমার অনুমান করছেন। অনার্যদের সঙ্গে এই অবৈদিক আর্যদের সংঘাতের সূত্রপাত সেই সময় থেকেই। সংঘাত দিয়ে শুরু হলেও অনার্যদের সঙ্গে অবৈদিক আর্যদের সহাবস্থান যে ঘটতে শুরু করেছিল তা অনুমান করা যায়। অনার্যদের মধ্যে কিছু মানুষ অন্তত অবৈদিক আর্য সমাজে স্থান করে নিয়েছিল দাস হিসেবে, চাষি হিসেবে, শ্রমিক ও কারিগর হিসেবে। যদিও তাদের ‘শূদ্র’ বলে ঘৃণা করা হত।^১ পরবর্তী কালে বৈদিক আর্যদের বিস্তার এই পূর্ব দিকেই, গঙ্গার অববাহিকা ধরে। কুরু, পাঞ্চাল, উশীনর, মৎস্য, শুরসেন, কোশল, কাশী ও বিদেহদের সমৃদ্ধ রাজ্য গড়ে উঠল, যা আর্যাবর্ত বলে চিহ্নিত, কোশল, কাশী, বিদেহ যার প্রান্ত সীমা। বুদ্ধ পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণে (১০০০-৬০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ) এদের উল্লেখ। এই রাজ্যগুলির জনসংখ্যা বৈদিক ও অবৈদিক আর্য, আর্যায়িত অনার্য ও অনার্য নিয়ে গঠিত। বিহারে আর্য বসতি গড়ে ওঠা ১০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের পরে। শতপথ ব্রাহ্মণে বৈদিক আর্যদের উত্তর বিহারে উপনিবেশ গড়ে ওঠার প্রসঙ্গ। ১০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের পরেই অবৈদিক আর্য ও আর্যায়িত অনার্য উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটছে বলে অনুমান করা যায়। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে সম্ভবত সেই প্রসঙ্গ, বলা হচ্ছে, যা দুর্য্যচার্য নয় তাকেও ব্রাত্যরা দুর্য্যচার্য বলত, অদীক্ষিত হয়েও দীক্ষিতের ভাষা বলত। <<a-dur-ukta-vākyaṁ dur-uktam āhur..... a-dīkṣitā dīkṣita-vācam vadanti>>.^২ পূর্বদেশের ভাষার প্রভাব যজুর, অথর্ব, এমন কি ঋকবেদেও—বিকট : বিকৃত; কাট : কর্ত; কুরু : কণু। অথর্ব বেদে অঙ্গ ও মগধ ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এক দূরবর্তী দেশ। বুদ্ধের সময়ে মগধ (দক্ষিণ বিহার) এক সমৃদ্ধ নগরী/রাজ্য। অর্থাৎ বুদ্ধের সময়ের অনেক আগেই মগধের আর্যভুক্তি। তা সম্ভবত ৮০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ নাগাদ। যদিও এই আর্যভুক্তির সময় বিতর্কিত। আর্যভুক্তির আগে মগধ অনার্য অধ্যুষিত। পরবর্তী কালে মগধের জনপদ মিশ্র, যা আর্য-অনার্য মিশ্রণের ফলে গড়ে উঠেছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, বগধ, চেরোপাদদের কথা, বগধ (মগধ) এবং চেরোপাদ পশ্চিম ও দক্ষিণ বিহারের অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ। তাদের পক্ষিকল্প বলা হয়েছে, যা সম্ভবত ভাষার অবোধ্যতার কারণে। সুনীতিকুমার অনুমান করছেন ‘বাঙলার মতনই বগধ বা মগধও উক্ত আরণ্যকের সময়ে আর্যদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়নি; এই জাতীয় লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেই এঁদের ‘বয়াংসি’ বা পাখী বলা হ’য়েছে’।^৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুন্ড্রদের কথা, তাদের নামানুসারে পুন্ড্রবর্ধনের

নামকরণ। বুদ্ধদেব পরবর্তী বৌদ্ধায়ন ধর্ম-সূত্রে বৈদিক ব্রাহ্মণরা পুন্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গেলে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান। অনার্যদের প্রতি বৈদিক আর্যদের ঘৃণা ও বিরূপ মনোভাব এই বিধানে প্রকট। আরণ্যকে (ও ব্রাহ্মণে) বঙ্গের নাম পাওয়া গেলেও প্রাচীন পালি সাহিত্যে বুদ্ধদেবের সময়ের আর্যাবর্তের যে জনপদের নামের তালিকা পাওয়া যায় সেখানে বঙ্গের নাম নেই (মগধ ও অঙ্গের নাম আছে)।^৪ বঙ্গের উল্লেখ না থাকার পশ্চাতে যে কোন একটি কারণ থাকতে পারে : ১) খুব সম্ভবত বুদ্ধের সময়ের আগে মিথিলা, মগধ ও অঙ্গের পূর্ব দিকে আর্যায়ন ঘটেনি, তাই বঙ্গের উল্লেখ নেই; ২) যে ষোলটি জনপদের নাম পাওয়া যায় সেগুলি মহাজনপদ, যার মধ্যে অঙ্গ ও মগধ আছে, বঙ্গ তখনও মহাজনপদ হিসেবে গড়ে ওঠেনি। মগধ ও অঙ্গের দীর্ঘ দিন পরে বঙ্গের অনার্যরা আর্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে এবং ক্রমশ আর্য সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় আশ্রয় খোঁজা শুরু করে। ঋকবেদ-এ একবার মাত্র ‘কীকট’ দেশনামের উল্লেখ, যে দেশকে যাস্ক অনার্য অধ্যুষিত বলে চিহ্নিত করেছেন, “কীকট নাম দেশনার্যোনিবাসঃ”। (ঋকবেদ ৩.৫৩.১৪) এই কীকট দেশই, পরবর্তী সংস্কৃত পণ্ডিতদের বিবেচনায় মগধ দেশ।^৫ চতুর্থ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে বঙ্গ মগধের সঙ্গে যুক্ত, অন্তত ব্যবসায়িক কারণে। মগধের সঙ্গে পূর্বদেশের, বিশেষত পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপনের মুহূর্ত থেকেই এই সব অঞ্চলে আর্যায়নের সূত্রপাত। অর্থাৎ নর্দিক গোষ্ঠির মানুষ এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করছেন, খুব ক্ষীণ হলেও এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটছে বলে অনুমান করা যায়। অনুমান করা যায় অশোকের সময়েই এই অঞ্চলে আর্যায়ন গতি পায়। “Aryanisation of Bengal, inaugurated in the 4th century BC, under the Mauryas, vigorously carried on under the Guptas, seems to have been completed by the 7th century.” — সুনীতিকুমারের অনুমান।^৬ অন্যত্র তিনি বলছেন, “আমার মনে হয়, মৌর্যরাই সব প্রথম বাঙলা জয় ক’রে আর্যাবর্তের সঙ্গে বাঙলার সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করেন। মৌর্য-যুগ থেকেই মগধের রাজ কর্মচারী, সৈনিক, বেণে, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ আর সাধারণ ঔপনিবেশিকেরা বাঙলা দেশে এসে বসবাস ক’রতে থাকে, আর তা’দের দ্বারাই মগধের আর্যভাষা বাঙলা দেশে আনীত আর স্থাপিত হয়। তা’র আগে হয়তো দু’চার জন ব্যবসায়ী বা বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক বা অন্য শ্রেণীর লোক, আর্যভাষী পশ্চিম দেশ থেকে অনার্য বাঙলায় যাওয়া-আসা ক’রত, কিন্তু মৌর্যদের বিজয়ের ফলে রাজশক্তির প্রভাব দ্বারাই আর্য ভাষা বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়—তা’র আগে বাঙলা দেশের স্থায়ী বাসিন্দা কেউ আর্য ভাষা বলত বলে বোধ হয় না।”^৭ অর্থাৎ চতুর্থ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের আগে এই ভূমি যাকে আমরা বঙ্গভূমি বলি তা জনশূন্য ছিল না। এখানে স্থায়ী বাসিন্দা ছিল এবং আর্যচেতনায় যাঁরা ‘শ্লেচ্ছ’ অভিধায় ভূষিত, তাই তো গঙ্গা-যমুনা পেরিয়ে এদেশে আসা আর্যদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান। এদেশের মানুষ যাদের ‘শ্লেচ্ছ’ বলে চিহ্নিত করা হল তারা কারা? সুনীতিকুমার বলছেন, “দেশে নানা দ্রাবিড় ও কোল-জাতীয় লোকের বাস ছিল, তা’দের নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, রীতি-নীতি সবই ছিল।”^৮ অঞ্চলটি যা পরে বঙ্গদেশ নামে নামে অবিহিত, তখনও পর্যন্ত এক দেশ হিসেবে গড়ে ওঠেনি, বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিভাজিত, পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, রাঢ়, সুন্মো বিভক্ত। বিভিন্ন জনগোষ্ঠির বাস, কোনো গোষ্ঠি প্রত্ন-অস্ত্রাল (সুনীতিকুমারের অভিধায় ‘কোল’) বংশোদ্ভূত, কোনো গোষ্ঠি ভূমধ্যসাগরীয় বংশজ (সুনীতিকুমারের অভিধায় দ্রাবিড়), কোনো গোষ্ঠি মোঙ্গলীয় বংশজাত। ভাষাগত দিক থেকেও তাঁরা আলাদা, ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠিভুক্ত, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-বর্মী। আর্য চেতনায় এঁরাই আর্যের জনগোষ্ঠির মানুষ, যাঁরা অনার্য বলে বিশেষিত, শ্লেচ্ছ।

ঐতরেয় আরণ্যকে (ষষ্ঠ-পঞ্চম খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ) বঙ্গ (বগধ, চেরোপাদ) জাতির উল্লেখ যাদের অস্তিত্বের উপর

নির্ভর করে বঙ্গ অঞ্চলের স্বীকৃতি। মগধের জনগোষ্ঠি আর যাদের চেরোপাদ বলা হয়েছে তাঁরা, সুনীতিকুমারের মতে, কোল জাতি সম্ভূত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুন্ড্র জাতির উল্লেখ যারা বর্তমানে পুঁড়ো জাতি বলে খ্যাত, তাঁদের উৎসও লুকিয়ে আছে অস্ট্রাল গোস্টির (সুনীতিবাবু যাদের ‘কোল’ বলেছিলেন) মধ্যে। এ ক্ষেত্রে এই একই সাহিত্যে উল্লেখিত ‘শুণশেপ’ উপাখ্যানের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রসঙ্গিক হবে না। ঋষি বিশ্বামিত্র যখন একজন ব্রাহ্মণ সন্তানকে দেবীকে তুষ্ট করার জন্য বলিদানের হাত থেকে রক্ষা করে দত্তক নেন তখন তাঁর সন্তানরা (পঞ্চাশ জন) তা ভাল মনে গ্রহণ করেনি। তখন ঋষি তাঁদের অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলে জাত পুত্রদের অন্যতম পুন্ড্র, শবর, পুলিন্দ, যাদের বাস আর্যাবর্তের সীমানার বাইরে, যারা ‘দস্যু’, ‘বিদেশি বর্বর’ বলে আখ্যায়িত। এই তিন গোষ্ঠির মানুষই নৃতাত্ত্বিক বিচারে অস্ট্রাল গোস্টিভুক্ত। মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্বেও এই একই উপাখ্যানের প্রতিধ্বনি। এই উপাখ্যানের মধ্যই যে আর্য্যভিমানের সূত্র লুকিয়ে আছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না আর প্রাচীন সাহিত্যে এই জাতিগুলির উল্লেখ নিঃসন্দেহে প্রাচীন বাঙলায় তাঁদের অস্তিত্বের সূচক। বুদ্ধদেবের পরবর্তী সময়ের বৌদ্ধায়ন-ধর্মসূত্র-এ মগধ ও তার পূর্ব দেশকে অসভ্য মানুষ অধ্যুষিত দেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ব্রাহ্মণদের বসবাসের অনুপযুক্ত। অথর্ববেদে এই অঙ্গ ও মগধের উল্লেখ যেভাবে করা হয়েছে তাতে এই অঞ্চলের প্রতি আর্যদের ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে ‘আসুর্য্যঃ প্রাচ্যঃ’, অর্থাৎ পূর্বদেশ অসুর অধ্যুষিত। জৈন সাহিত্য ‘আয়ারাংগসুত্ত’-এ ‘লাঢ়’ শব্দের উল্লেখ দেশনাম হিসেবে, আছে লাঢ় (‘রাঢ়’)-এর জাতির উল্লেখ, যারা অসভ্য, যাদের বাস বর্তমান দক্ষিণ বঙ্গে। অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গভূমি আদিতে বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ়, পুলিন্দ, অঙ্গ, সুঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত। পরবর্তী কালে সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে সেখানে আর্য প্রবাহ মিশেছে। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই সব জনগোষ্ঠি প্রত্ন-অস্ট্রাল, ভূমধ্যসাগরীয়, মোঙ্গল বংশোদ্ভূত। দৈহিক গঠনে তাঁরা যেমন আলাদা, ভাষাগত দিক থেকেও তাঁরা পৃথক। গৌড়কে কেন্দ্র করে বঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সপ্তম শতকে, শশাঙ্কের হাত ধরে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম/দ্বিতীয় দশক)। সপ্তম শতকেই সম্ভবত বঙ্গ ‘গৌড়বঙ্গ’ নামে একটা ভৌগোলিক চেহারা পাচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষ, যাঁরা ভাষাগত বিচারে মুণ্ডা, দ্রাবিড়, ভোট-চীনীয় গোষ্ঠিভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ যখন বঙ্গ পরিভ্রমণ করেন তখন তিনি অন্তত সুঙ্গ অঞ্চলের ভাষা যে মধ্যদেশের ভাষার থেকে আলাদা তা লক্ষ করেছিলেন। অর্থাৎ যদি আমরা ধরে নিই চতুর্থ শতক থেকে এই অঞ্চলে আর্যায়নের সূত্রপাত হচ্ছে, ভাষাগত দিক দিয়ে সপ্তম শতকেও বঙ্গের সমস্ত অঞ্চলে আর্যভাষা গৃহীত হয়নি। সেখানে তখনও অনার্য ভাষার রেশ।

মিশ্রণ : রক্তে ও দৈহিক গঠনে

আর্যরা মগধের পূর্ব দেশে আসার আগেই এই ভূখণ্ডের আদি বাসিন্দা বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বলেই অনুমান করা যায়। এখানে মিশ্রণ যেমন ঘটেছিল রক্তে, তেমনই আচারে, সংস্কারে, বাস্তব এবং মানসিক সংস্কৃতিতে, দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার কারণে। সুনীতিকুমারের মতে, আর্যায়নের সূচনায়, প্রথম স্তরে, এই তথাকথিত অনার্যদের আর্য সমাজে অঙ্গীভূত করার চেষ্টা, তারপর অবৈদিক আর্য ও অনার্যদের মধ্যে মিশ্রণের সূত্রপাত। আরেক ধরনের মিশ্রণও গড়ে উঠল বিভিন্ন অনার্য গোষ্ঠির মধ্যে রক্ত মিশ্রণের মধ্য দিয়ে। আচারে, সংস্কারে, সংস্কৃতিতেও এই মিশ্রণ প্রতিফলিত হল। ভারতের জাতিপ্রবাহে বাঙালির স্থান নির্ণয়ে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যও এখানে উল্লেখের দাবি রাখে, “এই সুদীর্ঘ জাতিপ্রবাহের ইতিহাস আলোচনায় একটি তথ্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। ... নরতত্ত্বের দিক হইতে বাঙালার জনসমষ্টি মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস আদি-অস্ট্রেলীয় বা ‘কোলিড’, দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নতনাস মিশর-এশীয়

বা ‘মেলানিড’, এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড উন্নতনাস অ্যালপাইন বা ‘পূর্ব ব্র্যাকিড’ এই তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত। নিগ্রবটু রক্তেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তরে এবং সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মোঙ্গলীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাহাও উত্তর ও পূর্ব দিকে সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির সীমা অতিক্রম করে নাই। আদি নর্ডিক বা খাঁটি ‘ইণ্ডিড’ রক্তপ্রবাহও অনস্বীকার্য, কিন্তু সে ধারা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও ক্ষীণ। মোটামুটিভাবে ইহাই বাঙলাভাষাভাষী জন-সৌধের চেহারা, এবং এই জন-সৌধের উপরই বাঙ্গালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সূত্রপাত”^{১০} তবে এই মিশ্রণের মধ্যে মাত্রাগত তারতম্যও রয়ে গেছে। আর একটু স্পষ্ট করে বললে বাঙালির সত্ত্বায় দু’ধরণের উপাদান মিশেছে—এক, কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের উপাদান, যাদের ‘ম্লেচ্ছ’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল; আর দুই, উচ্চ বর্ণের উপাদান। প্রথম দল বাঙলার প্রাচীন অধিবাসী যাদের বৈদিক সাহিত্যে ‘নিষাদ’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। রমাপ্রসাদ চন্দ ও এদের ‘নিষাদ’ বলে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা এখানে জরুরি না হলেও এ কথাটুকু বলে রাখা ভাল সামাজিক অনুক্রমে নিম্নবর্ণের বাঙালির মধ্যে যে ‘জন’-এর প্রভাব সব থেকে বেশি, তাঁরা এই আদি-অস্ট্রেলীয় বা প্রত্ন-অস্ট্রাল বা নিষাদ গোষ্ঠির মানুষ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বাঙালির নৃতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণে দেখিয়েছিলেন, বাঙলার বাগদি আর পোদ জাতির মধ্যে ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মিশ্রণ অনেক বেশি।^{১০} “Resemblance of the Kayasthas, the Sadgopas and the Kaivartas with the aboriginal tribes of Chota Nagpur is not appreciable. Indications of such intermixture increase as we go down the social scale, being very large, for example, in the cases of the Bagdis and the Pods.”^{১১} নব্যপ্রস্তর যুগীয় বা নবোপলীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন এই নিষাদ গোষ্ঠীই বাঙলার জনগণের অধঃস্তর (substratum) গড়ে দিয়েছিল যা ঢাকা পড়েছিল পরবর্তী স্তরে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাবে। সুনীতিকুমার বলেছিলেন, “বাঙালী জাতিটা যে একটা মিশ্র অনার্য জাতি—মোঙ্গল, কোল, মোন-খমের, দ্রাবিড় এই সব মিলে সৃষ্ট খিচুড়ি, যাতে আর্যত্বের গরম-মশলাটুকু পড়েছে মাত্র”^{১২} অর্থাৎ অন্যান্য জনগোষ্ঠির উপাদান থাকলেও প্রত্ন-অস্ট্রাল (সুনীতিবাবুর ভাষায় ‘কোল’) উপাদান যে অন্যতম তা স্বীকৃত। নির্দিষ্ট ভাবে বললে, এ কথা স্বীকৃত যে ভারত সভ্যতার ভিত্তি যা মূলত গ্রামীণ ও কৃষিকেন্দ্রিক তা গড়ে তুলেছিলেন এই প্রত্ন-অস্ট্রাল বা নিষাদ গোষ্ঠির মানুষ, বাঙলার ক্ষেত্রেও তা সমান ভাবে প্রযোজ্য।

শুধু তা-ই নয়। ভাষাগত দিক দিয়েও এই প্রত্ন-অস্ট্রাল বা নিষাদ গোষ্ঠির যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল তা বোঝা যায় যখন সুনীতিকুমার Alpine গোষ্ঠির মানুষরাও দ্রাবিড় বা কোল ভাষায় কথা বলত বলে অনুমান করেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করতেন Alpine গোষ্ঠির মানুষ আর্যভাষী ছিলেন। সুনীতিকুমারের এই মত মনঃপুত হয়নি। তিনি বলছেন, “আমার মনে হয় আর এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিৎ কারো-কারো মতও আমার অনুকূল যে এই [৩]-শ্রেণীর (অর্থাৎ Alpine Shortheds) লোকেরা নবাগত আর্য অথবা মোঙ্গলদের ভাষা বলত না। —সম্ভবত তাঁরা দ্রাবিড় বা কোল ভাষা বলত; কিংবা অধুনালুপ্ত অন্য কোনও অনার্য ভাষা বলত। ...আর্যভাষা, উত্তর-ভারত অর্থাৎ এখনকার উত্তরপ্রদেশ আর বিহার থেকে আগত বিশুদ্ধ বা মিশ্র [১]-শ্রেণীর (North Indian Longheads) উপনিবেশিকের মুখে বাঙলাদেশে প্রসৃত হবার পূর্বে, বাঙলাদেশে [২] (South Indian or Dravido-Munda Longheads), [৩] (Alpine Shortheds) আর [৪]-শ্রেণীর (Mongolian Shortheds) যে অধিবাসীরা বাস করত, তাঁরা যে আর্যভাষী ছিল না, এ কথা বললে অযৌক্তিক কথা বলা হয় না। বাঙলার অধিবাসীদের মূল উৎপত্তি যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি থেকেই হোক.... তাঁরা অনার্যভাষী ছিল বলেই অনুমান হয়। ... বাঙলা দেশে আর্যভাষা আগমনের পূর্বে, কোল আর

দ্রাবিড়, আর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ভোট-চীনা, এই তিনটি ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণ পাই—গোল-মাথা Alpine shorthead -দের মধ্যে অন্য কোনও ভাষা ছিল কিনা জানবার উপায় নেই। এটা অসম্ভব নয় যে, তাঁরা [১]-শ্রেণীর আর্যদের আসবার আগে, [২]-শ্রেণীর ভাষা কোল আর দ্রাবিড় গ্রহণ করেছিল; আর বাঙলা দেশের প্রচলিত ভাষাগুলির সমাবেশ, আর কোল, দ্রাবিড়, ভোট-চীনা ছাড়া অন্য ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণের অভাবে, [২]-শ্রেণীর লোকেরা, আর্যদের আগমনের কালে যে ভাষায় দ্রাবিড় আর কোলই ছিল, এই অনুমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি হয়—এর বিরুদ্ধে অন্য কোনও যুক্তি মনে লাগে না।”^{১৭} তিনি আরও জানিয়েছেন, “বাঙলা দেশে যে অনার্যের বসতি ছিল, তা’ আমরা এ দেশের প্রত্যন্তভাগে এখনও অনার্য জাতির বাস দেখে অনুমান করতে পারি। বাঙলা দেশের আদিম অধিবাসীদের অনার্য-ভাষিতার আর-একটি প্রমাণ পাই বাঙলার গ্রাম আর পল্লীর নাম থেকে”।^{১৮}

মিশ্রণ : ভাষা ও সংস্কৃতিতে

এই গোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতি নিয়ে সুনীতিবাবু যা লিখেছিলেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় শুধু দৈহিক গঠনের বিচারে বাঙালি মিশ্র অনার্য জাতি নয়, বাঙালির বাস্তব ও মানসিক সংস্কৃতির বনিয়াদও গড়ে উঠেছিল এই মিশ্রণের ফলে। তাঁর বক্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। “The Austric-speaking tribes of India appear to have belonged to more than one group of the Austroasiatic section—to the Kol, to the Khasi, and to the Mon-Khmer groups. They were in the neolithic stage of culture, and perhaps in India they learned the use of copper and iron. They developed a primitive system of agriculture in which a digging stick ... was employed to till the hill-side. Terrace cultivation of rice on hills, and plains cultivation of the same grain were in all likelihood introduced by them. They introduced or developed, as the names from their language would suggest, the cultivation of the coconut (*nārikēla*), the plantain (*kadala*), the betel vine (*tāmbula*), the betel-nut (*guvāka*), probably also turmeric (*haridrā*) and ginger (*śrngavēra*), and some vegetables like the brinjal (*vātingāna*) and the pumpkin (*alābu*). they were probably the first people to tame the elephant, and to domesticate the fowl. The habit of counting by twenties in some parts of North India (cf. Hindi *kōré*, Bengali *kuṛi*, ‘score, twenty’ from the Austric) appears to be the relic of an Austro-Asiatic habit. The later Hindu practice of computing time by days of the moon (*tithis*) seems also to be of Austric origin.”^{১৯}

কৃষিকেন্দ্রিক বাঙলায়, এমনকি আসাম, বিহার, বাড়খন্ড এবং ওড়িশায়, ‘কুড়ি’কে মান ধরে গণনা পদ্ধতি যেমন আজও চলমান, তার পাশাপাশি ছোট ছোট মানের মাধ্যমে কৃষিজাত দ্রব্য ও গৃহস্থালির অন্যান্য দ্রব্য গণনার পদ্ধতি আজও প্রচলিত। যেমন ‘গণ্ডা’, চার-সংখ্যাকে ভিত্তি ধরে গণনা, এক গণ্ডা, দু গণ্ডা, বিশেষত ধানের আঁটি গোনার ক্ষেত্রে, জ্বালানি কাঠ বা ঘুটে গোনার ক্ষেত্রে। গণনার ক্ষেত্রে এর পরের বড় মান ‘পন’, অর্থাৎ কুড়ি গণ্ডা বা আশি। ‘কুড়ি’ শব্দটি এবং ‘কুড়ি’কে মান ধরে গোনার পদ্ধতি যে অস্ট্রিক তা তো অনেক কাল আগে প্রশ্লঙ্কি, সুনীতিকুমার বলেছেন। অস্ট্রিকভাষী মানুষের মধ্যে ‘কুড়ি’-কে মান হিসেবে ব্যবহার করার সঙ্গে হাতের ও পায়ের কুড়ি আঙ্গুলের সম্পর্ক আছে। ‘কুড়ি’ সংখ্যাটি আক্ষরিক অর্থে সব অস্ট্রিক ভাষায় না পাওয়া গেলেও দশ সংখ্যার সূচক হিসেবে পালাওং ও রিয়াং ভাষায় শব্দটির (পালাওং ‘কুর’, রিয়াং ‘স-কোল’) অস্তিত্ব প্রশ্লঙ্কি লক্ষ্য করেছিলেন। সেই ‘কুর’ মূল যেটি নিম্ন বার্মা বা মায়ানমারে দশ সংখ্যা সূচক তাই বড় সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে মূল হিসেবে গৃহীত হল, যেমনটি

ঘটল মুন্ডা ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে তেমনই বাঙলায়। শুধু তাই নয়, সুনীতিকুমার, প্রশ্লক্ষি ‘কুড়ি’ শব্দ যে আসলে একজন মানুষের দ্যোতক তা বিভিন্ন মুন্ডা ভাষার মনুষ্যবাচক ‘হড়’, ‘হোড়’, ‘হোড়ো’, ‘কোরো’ শব্দের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছিলেন। প্রশ্লক্ষির সিদ্ধান্ত, “Thus one can easily understand that the same root has served the purpose of designating the individual not as an indivisible unit but as a numerical whole.... It can be thus imagined that amongst the Austro-Asiatic peoples also, for expressing 10 or 20 one has thought of “man” provided with 10 fingers if his hands only are considered and with 20 fingers if all the four members of his body are counted.”^{১৬} প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তুড়ি নামক মুন্ডা গোষ্ঠির এক ভাষায় ‘তি’ ‘হাত’ পাঁচ সংখ্যা নির্দেশক। বলে রাখা ভাল, ‘কুড়ি’ সংখ্যা ‘কোটি’ শব্দজাত বলে অনেকে অনুমান করেছিলেন। তা যে অসম্ভব একটি অনুমান তা বিভিন্ন ভাষার সংখ্যা শব্দের উৎপত্তি থেকে বোঝা যায়। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই ছোট সংখ্যার দ্যোতক বড় সংখ্যা বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়, বড় সংখ্যার দ্যোতক ছোট সংখ্যার মান হিসেবে ব্যবহার হয় না। এ ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। ‘কোটি’ যেহেতু বৃহৎ সংখ্যার দ্যোতক, তাই তা ছোট সংখ্যার দ্যোতক ‘কুড়ি’ বোঝানোর জন্য ব্যবহার হতে পারে না বলেই অনুমান হয়। মুণ্ডা (অস্ট্রিক) গোষ্ঠির ‘চার’-কে মান ধরে গণনার রীতি থেকেই বাঙলায় গুণ্য পদ্ধতির উদ্ভব। ‘চার’-কে মান হিসেবে ব্যবহারের মধ্যে লুকিয়ে আছে মুণ্ডা (অস্ট্রিক) গোষ্ঠির মানুষের সংস্কার। হাতের বা পায়ের আঙ্গুল গণনার একক হিসেবে ব্যবহার করার রীতি তাঁদের মধ্যে থাকলেও যখন হাতের আঙ্গুলকে বিশেষ একটি মান হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অশুভ হিসেবে বিবেচ্য। অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বাদ দিয়ে বাকি চার আঙ্গুল নিয়ে একটি মানগুণ্য। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে বাদ দিয়ে গণনার এই সংস্কার পৃথিবীর অনেক প্রাচীন জনগোষ্ঠির গণনা পদ্ধতির মধ্যেও লুকিয়ে আছে। বাঙালির কাছেও যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অশুভ তা মুণ্ডা (অস্ট্রিক) সংস্কারেরই উত্তরাধিকার। নীহাররঞ্জন রায়ের বিবেচনাতোও প্রশ্লক্ষির প্রতিধ্বনি। তিনি লিখেছিলেন, “আসামে ও বাঙলাদেশে এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (বিশ বা বিংশ নয়) এক পণ, অর্থাৎ ৮০টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত। হাতে বাজারে পান, সুপারি, কলা, বাঁশ, কড়ি এমন কি ছোট মাছ ইত্যাদি দ্রব্যও এখনও এইভাবেই গণনা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এই কুড়ি শব্দটি এবং এই গণনা রীতিটি—দুই-ই অস্ট্রিক। সাঁওতালী ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ কথাটির অর্থ ৮০ এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪০। মূল অর্থ চার। অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের ভিতর কুড়ি শব্দ মানবদেহের কুড়ি আঙ্গুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত; কুড়িই তাহাদের সংখ্যা গণনার শেষ অঙ্ক এবং কুড়ি লইয়া এই মান। কাজেই এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (৪ × ২০ = ৮০) এক পণ। এক অর্থে আশিও পণ চারও পণ। এই পণও তাহা হইলে অস্ট্রিক শব্দ। আবার কুড়ি গোণ্ড বা গণ্ডতে এক পণ (= ৮০), এও অস্ট্রিক ভাষারই গণনা। অর্থাৎ এক গোণ্ড গণ্ডতে চার সংখ্যা; প্রত্যেক কুড়িতে (৪ × ৫) পাঁচটি গোণ্ড। এই গোণ্ড বা গণ্ডই বাঙলায় গুণ্য যাহা চার সংখ্যার সমান। চার কুড়িতে এক পণ। এই গুণ্য হইতেই খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকের প্রাকৃত মহাস্থান শিলালিপির গণ্ডকমুদ্রা। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই গণ্ডকমুদ্রার প্রচলন বাঙলাদেশে ছিল”।^{১৭}

সুনীতিবাবু নির্দেশিত উপযুক্ত বাস্তব সংস্কৃতির শব্দ-তালিকার বাইরেও আরও বেশ কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া যায় যেগুলি মুন্ডা (অস্ট্রিক) ভাষা জাত বলেই মনে হয়। সুনীতিকুমার, সিন্ধা লেভি, প্রশ্লক্ষি, জুল ব্লক, প্রবোধচন্দ্র বাগচি উল্লেখিত এই ধরনের আরও বেশ কিছু শব্দ স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন, বাঙলা খাঁখাঁ, খাঁখার (abuse), বাঁখারি (বাখারি বা চেড়া বাঁশ), বাদুড়, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো), জাং (জঙ্ঘা), ঠেং (গোড়ালি

থেকে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের অংশ), ঠোঁট, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, ছোঁচা, কলি (চুন), ছোট, পেট, খোসা, ঝোড় বা ঝাড়, ঝোপ, পুরাতন বাঙলায় চিখিল (কাদা), ডোম (প্রাচীন বাঙলায় ডোম-ডোম্বী), চোঙ, চোঙ্গা, মেড়া (ভেড়া), বোয়াল, করাত, দা বা দাও, পগার (জলময় গর্ত বা প্রনালী), গড়, বরজ (পানের), কামরাঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত শব্দই মূলত অস্ট্রিক গোষ্ঠির ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ।^{১৮} শুধু তাই নয়, গঙ্গা ও বঙ্গ শব্দ দুটিও অস্ট্রিক ভাষার দান বলেই তাঁরা মনে করেন। [গঙ্গা শব্দের মূল অর্থ লুকিয়ে আছে নদী শব্দের মধ্যে] প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা ভাল লেভি, প্রশ্লক্সি, ব্লক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মোন-খমের গোষ্ঠির (মোন, খমের, বাহনার, স্টিয়েং, রিয়াং, পালাওং প্রভৃতি) অনেক ভাষার সঙ্গে তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ডোঙ্গা, টেংকি, ঢাকা, দুলি (কচ্ছপ), টং (উচ্চ স্থান), ঝিঙ্গে, ডেঙ্গর, টেঙ্গা, ঢোল, ঢাল, ডাঙ্গা, ঝাঁটা, ঢিল, ঢেউ, ডাব, বোল, আকাল, আখড়া, বড়শি, বট, বয়ার (মহিষ), কাড়া, কাড়ি (মহিষ), চুলা, কুলহি, হুড়কা, খুঁটি, নেঙ্গা, রাঁড়, ঠোঙা, তোতলা, আচকা, অড়া, কাটুল, ডি, হাড়াম, আঞ্জির প্রভৃতি গ্রাম বাঙলায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য শব্দ মুন্ডা (অস্ট্রিক) শব্দ জাত বলেই মনে হয়। আর্যদের বাঙলায় আসার অনেক আগেই ‘খান’ এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। খ্রিস্ট-পূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতকের মহাস্থানগড়ের শিলালিপিতে খানের উল্লেখ। বনবন, টুংটাং, গড়গড়, হুড়মুড়, দুড়দাড়, কাঁচাম্যাচ, চাঁগাভা প্রভৃতি অনুকার শব্দও মুন্ডা (অস্ট্রিক) প্রভাব জাত। সিন্ধী লেভি যমজ নামকরণ পদ্ধতি অস্ট্রিক প্রভাব জাত বলেই মনে করেন, “Pulinda-Kulinda, Mekala-Utkala (with the group Udra-Pundra-Munḍa), Kosala-Tosala, Aṅga-Vaṅga, Kalinga-Tilinga form the links of a long chain which extends from the eastern confines of Kashmir up to the centre of the peninsula... In each ethnic pair the twin bears the same name, differentiated only by the initial K and T; initial K and P; zero and V or m and p. This process of formation is foreign to Indo-European; it is foreign to Dravidian; it is on the contrary characteristic of the vast family of languages which is called Austroasiatic, and which covers in India the group of the Munda languages, often called also the Kolarian.”^{১৯}

বাঙলা বাক্য রচনারীতির ক্ষেত্রে যে সরলতা, বৈদিক রচনারীতির থেকে যে অনেকাংশে মুক্তি তা শুধুমাত্র দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষারীতির প্রভাবের ফলে নয়, মুন্ডা (অস্ট্রিক) প্রভাবকেও অস্বীকার করা যাবে না। প্রাকৃত ভাষা যদি অনার্যদের মুখে পরিবর্তনের ফলেই গড়ে উঠে থাকে তাহলে তো সেই অনার্য গোষ্ঠি শুধু দ্রাবিড় ভোট-বর্মী নিয়ে গড়ে ওঠেনি মুন্ডা (অস্ট্রিক) গোষ্ঠির মানুষও তো সেই অনার্যদের অন্যতম অংশ। তাই দ্রাবিড়, ভোট-বর্মীদের মুখে আর্যভাষা বদলে যেমন দ্রাবিড়, ভোট-বর্মী রূপ পরিগ্রহ করেছে তেমনি মুন্ডাভাষীদের মুখে বদলের সময়ও মুন্ডা (অস্ট্রিক) বাকরীতি থেকে মুক্ত হতে পারে নি। তাই তো বাঙলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দ, অনুকার, ধ্বন্যাত্মক শব্দের আধিক্য। আদি আর্যের পূর্বসর্গের পরিবর্তে যে বাঙলায় পরসর্গের আধিক্য তা তো শুধু দ্রাবিড়, ভোটবর্মী প্রভাবজাত নয়, মুন্ডা ভাষারও সেই একই বৈশিষ্ট্য (কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া)। তদ্রূপ বাঙলায় যে যুক্তব্যঞ্জনর অভাব তাও তো মুন্ডাদের (অস্ট্রিক) ভাষার বৈশিষ্ট্য। এমন একটিও মুন্ডা ভাষার উদাহরণ নেই যেখানে যুক্তব্যঞ্জন আছে। অসমাপিকা ক্রিয়া, সহায়ক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বাঙলা ও মুন্ডা ভাষার মধ্যে স্বরধ্বনির পরিমাণগত মিল লক্ষ্য করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সুনীতিকুমারকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিলেন “এস্থলে বাঙ্গালার সহিত সাঁওতালী ভাষার কতিপয় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় : যেমন, বাঙ্গালায় একাক্ষরিক ...মূল শব্দগুলি ...সর্বদাই দীর্ঘ, সাঁওতালীতেও তদ্রূপ। দুই মাত্রিক শব্দের প্রতি বাঙ্গালার প্রবণতা সাঁওতালীতেও দেখা যায় : অর্থাৎ একটি দীর্ঘাক্ষরিক বা দুটি লঘু আক্ষরিক অথবা একটা খুব লঘু আক্ষরিক (১/২ মাত্রা বা ৩/৪

মাত্রার) ও অন্যটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ১ ১/২ বা ১ ১/৪ মাত্রার অক্ষরের দ্বারা গঠিত দুই মাত্রার শব্দের দিকে ইহাদের ঝোঁক আছে। আবার বাঙ্গালার মতই, একাক্ষরিক মূল শব্দগুলিতে বিভক্তি যোগ করা হইলে ইহারা দীর্ঘতা হারাইয়া দুইটি লঘু আক্ষরিক শব্দে পরিণত হয়।^{২০}

বঙ্গদেশে এমন অনেক স্থান নাম আছে যেমন -সোল, -জোল-যুক্ত যে স্থাননাম, -কুলি (কুলহি)-যুক্ত স্থাননাম, -গাড়, -ডাঙ্গা বা -ডাং, -টিকর, -টাঁড়, -কানালি (হলুদ কানালি, খোইরাকানালি), (বাদ ও সোলের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড), -বাদ, (অসুরবাদ), -তোড়া, -গড়া (জলাশয়) (অসুরগড়া), হিড়-যুক্ত প্রভৃতি নামগুলিও মুণ্ডা (অস্ট্রিক) প্রভাবজাত। গ্রাম বাঙলার আরও কিছু স্থাননাম আছে যেগুলি মুণ্ডা (অস্ট্রিক) ভাষার, যেমন আইড়া (ওঝা)। [এই স্থানগুলির অধিকাংশই সীমান্তবঙ্গের, যেখানে সাঁওতাল, মুণ্ডাদের বাস]। -দ/-দহ পরপদযুক্ত স্থাননামগুলিও যে মুন্ডা(অস্ট্রিক) প্রভাব জাত তা সুনীতিকুমার, প্রবোধচন্দ্র বাগচি, প্রশ্লক্সি, সিন্ধা লেভি, জুল ব্লকরা অনুমান করেছিলেন।

বঙ্গদেশের মানসিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও মুণ্ডা (অস্ট্রিক) সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব। দেব ভাবনায়, দেব কল্পনায়, পূজার্ননায়, বিবাহের লোকাচারে, জন্ম-মৃত্যু সংস্কারের আড়ালে ফসিল হয়ে থাকা মুণ্ডা (অস্ট্রিক) উপাদান ও চেতনা খুঁটিয়ে দেখলে মিশ্র (সংকর) বাঙালির চেহারা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বঙ্গদেশের গ্রামেগঞ্জে যে বৃক্ষ পূজার প্রথা তা মুণ্ডা (অস্ট্রিক) গোষ্ঠির অবদান বলে অনুমান করা যায়। মুণ্ডা গোষ্ঠির মানুষজন সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা মূর্তি পূজা করেন না। উন্মুক্ত আকাশের নিচে তাঁদের দেবতাকে আবাহন। গাছ পাহাড়, পশুকেই তাঁরা দেব জ্ঞানে পূজা করেন। এখান থেকেই গ্রাম-বাংলায় বট, শ্যাওড়া প্রভৃতি গাছকে পূজা করার প্রথার উদ্ভব। আর পাথর পূজা তো গ্রাম বাংলায় বিশেষ প্রচলিত। কোনো প্রাচীন গাছের আশ্রয়ে (বিশেষত বট, অশ্বথ ইত্যাদি) শিলা খণ্ড দেবতা রূপে পূজা করার প্রথা গ্রাম বাংলায় বহুল প্রচলিত।

নিম্ন বর্ণের বাঙালির মধ্যে যে ধর্ম পূজার প্রচলন, ধর্ম ঠাকুরের অস্তিত্ব তা তো আসলে প্রাগায্য আদিম কৌম সমাজের উত্তরাধিকার। পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশি নানা দেবতার সঙ্গে মিশে গিয়ে ধর্ম ঠাকুরের উদ্ভব ঘটেছে। ধর্ম ঠাকুরের পূজোপকরণে গাছ, হাঁস, শূকর বলি এবং ধর্মপূজার পদ্ধতিতে মুণ্ডা প্রভাব। ধর্মের গাজনে কৃচ্ছতা সাধন ও দৈহিক নির্যাতনে মুণ্ডা প্রভাব নিশ্চিত ভাবে বর্তমান। ধর্মের পূজারী নিম্নবর্ণের মানুষ, নিম্নবর্ণের মধ্যেই ধর্মপূজার প্রচলন বেশি বলে। আসলে বঙ্গদেশের নিম্নবর্ণের (বিশেষত পোদ, বাগদি, বাউড়ি, হাড়ি, ডোম) মানুষের সঙ্গে মুণ্ডা (অস্ট্রিক) গোষ্ঠির মানুষের রক্তের মিশ্রণ সর্বাধিক। তাই নিম্নবর্ণের পূজিত দেবতার মধ্যে অস্ট্রিক প্রভাব বেশি থাকাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ধর্মের গাজনের যে উদ্দাম নৃত্য তা নিশ্চিতভাবে মুণ্ডা (অস্ট্রিক) অবদানের ফসল বলে সুনীতিকুমার মনে করেন। “Now dance as a fundamental religious ritual is certainly not Aryan; it is neither Buddhistic nor Brahmanical. It may be Dravidian; it may also be Tibeto-Chinese but it is emphatically Austric.”^{২১}

ছোটনাগপুর অঞ্চলে ও মালভূমি সংলগ্ন বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীষ্মে লিঙ্গ জ্ঞানে পাহাড়ে জল ঢালার প্রথা এখনও মুণ্ডা গোষ্ঠির কোনও কোনও আদিবাসীদের (সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি) মধ্যে বর্তমান। চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিব লিঙ্গে জল ঢালা বঙ্গের সর্বত্র এক বিশেষ ব্রত/আচার হিসেবে পালিত। পৌরাণিক শিবেরও আবাস পাহাড়ে। মুন্ডা গোষ্ঠির মানুষের প্রধান দেবতা ‘মারাং বুরু’। অর্থাৎ পাহাড় পূজেই যে বঙ্গের শিব উপাসনার উৎস, এ কথা অনুমান করলে খুব একটা অতুলিত্তি হবে না। (শ্মশানবাসী শিবের ধারণা দ্রাবিড় প্রভাবজাত)। বঙ্গে আর্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে এই লিঙ্গ পূজাও বাঙালির দেব ভাবনায় আশ্রয় পেয়েছে। অথর্ববেদ অনুযায়ী ব্রাত্যদের মধ্যে যে শিব পূজার অস্তিত্ব তা বৈদিক আর্যদের থেকে আলাদা। বঙ্গের শিব চেতনায় অশাস্ত্রীয় বহু উপাদানের মিশ্রণের ফলেই যে এই পার্থক্য তা বোঝা যায়।

মুন্ডা গোষ্ঠীর মানুষ কৃষিজীবী হওয়াতে বঙ্গের কৃষি সংক্রান্ত অনেক পাল-পার্বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে মুন্ডা গোষ্ঠীর প্রভাব। গ্রাম বাঙলার কৃষি-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত নবান্ন উৎসব, অনেক মেয়েলি ব্রতের পিছনে রয়েছে মুন্ডা (অস্ট্রিক) গোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব। নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছিলেন, “... আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার-অনুষ্ঠানই এই আদিম অস্ট্রিকভাষী জনদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।”^{২২} বঙ্গদেশে ধানের শিষকে লক্ষ্মী জ্ঞানে পূজো, ধানের শিষকে লক্ষ্মীর আভরণ হিসেবে ব্যবহার করার মূলেও অস্ট্রিক প্রথা। সাঁওতাল, এমনকি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ওরাও সম্প্রদায়ের মানুষ আজও ধান্য-শীর্ষ পূর্ণ ঘট পূজো করেন। ধানের শিষগুচ্ছকে সারণা দেবীর জটা বলে তাঁদের বিশ্বাস। রাঢ়বঙ্গে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোয় এবং ‘বার’ লক্ষ্মীর পূজোয় ধানের শিষ অন্যতম উপাচার। ‘বার’ লক্ষ্মীর পূজো তো শিষ-পূর্ণ ধান গাছেরই পূজো। আর ত্রৈমাসিক লক্ষ্মী পূজো তো ধানেরই পূজো।

বাঁধনা পরব যা গ্রামে গঞ্জে গোখুঁটা, কোথাও বা গোপার্বণ রূপে পালিত তার পিছনেও মুন্ডা (অস্ট্রিক) কৃষি-সংস্কৃতির অস্তিত্ব। আজও মুন্ডা গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বাঁধনা (গো-পূজা) বিশেষ উৎসব হিসেবে পালিত।

বাঙালির দোল উৎসব তো রঙের উৎসব, ফুলের উৎসব। সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, শবর, খাড়িয়া সব গোষ্ঠীর মানুষ ফুলের উৎসব ‘বাহা’ পরব পালন করেন ফাল্গুন মাসে, যেমনটি হয় হিন্দু বাঙালি সমাজে। মুন্ডা গোষ্ঠীর এই ফুলের উৎসব বাঙালির দোল উৎসবের উৎস নয় তো! নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছিলেন, “বাঙলাদেশে হোলি বা হোলাক উৎসব এবং নিম্ন শ্রেণির মধ্যে চড়ক পূজার মিশ্রিত সমন্বিত রূপ বিশ্লেষণ করিলে এমন কতকগুলি উপাদান ধরা পড়ে যাহা মূলত আর্যপূর্ব আদিম নরগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও প্রচলিত।”^{২৩}

পূজা-অর্চনা বা শুভ অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়া বাঙালির লোকাচারের একটি বড় অঙ্গ। গাছ, পশুপাখির motif ব্যবহার করে বাড়ি বা ঘরের প্রবেশ পথ, পূজাস্থল অলংকরণের রীতি আজও মুন্ডা (অস্ট্রিক) [ও দ্রাবিড়] গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে জীবন্ত। সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষ বাড়ির দেওয়াল অলংকৃত করেন ফুল, পাতা, পশুপক্ষীর অবয়ব চিত্রণের মধ্য দিয়ে। তা শুধুমাত্র অলংকরণ নয়, অশুভ শক্তির হাত থেকে বাড়ি-ঘর, পূজাস্থলকে রক্ষা করার বেষ্ঠনি হিসেবে এই আলপনা বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেও এই আলপনা দেওয়ার রীতি আজও জীবন্ত, গ্রাম শহর সর্বত্র। সেখানেও এই শুভাশুভের ধারণা ক্রিয়াশীল। বাঙালির এই আলপনা দেওয়ার রীতি যে প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর অবদান তা নিসন্দেহে বলা যায়।

বাঙালির বিবাহে শাস্ত্রীয় আচারের পাশাপাশি লোকাচারের এক বড় অঙ্গ—পান, সুপারি, নারিকেল, কলা, আম্র পল্লব, কলা গাছ, কলাতলা, ছাদনা তলা, উলুধ্বনি এ সবই লোকাচারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মুন্ডা সমাজেও উপাদানগুলির অস্তিত্ব। সুনীতিকুমার এ ব্যাপারে সমগ্র হিন্দু সমাজ, হিন্দু আচার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন বাঙলা ও হিন্দু বাঙালির ক্ষেত্রে তা একই ভাবে প্রযোজ্য, “...the use of the betel-leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion... our marriage ritual in some parts of India with the use of vermillion and turmeric—and many other things would appear to be a legacy from our pre-Aryan ancestors.”^{২৪}

আম্র পল্লবের বেষ্ঠনি দ্রাবিড় ও মুন্ডা সব সমাজেই বর্তমান। বিয়ের আসরে কলাগাছ যেমন দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই ব্যবহৃত হয়, বাঙালির বিয়ের আসরেও তাই। মুন্ডা সমাজে বিয়েতে বরকনে স্নান করাবার জন্য তৈরি হয় কলাতলা। বাঙালির বিয়েতে কলাতলা বরকনের স্নানের স্থান, লৌকিক বিয়ের আসর। বরগড়ালার অন্যতম উপকরণ কলার ছড়া, পান।

উলুধ্বনি মুণ্ডা গোষ্ঠির মানুষের সামাজিক বিয়ের আরেক অন্যতম কৃত্য। উলুধ্বনির মাধ্যমে সমাজের পঞ্চজনকে আবাহন। বাঙালির বিয়েরও অঙ্গ উলুধ্বনি। মুণ্ডা সমাজে বিয়ের অন্যতম উপকরণ জলপূর্ণ ঘট, আম শাখা, ধান, সিরোম (কাশ ঘাসের কাঠি), আতপ চাল, দুর্বা ঘাস। বাঙালির বিয়েরও উপকরণ অনুরূপ। মুণ্ডা গোষ্ঠি বিশেষত সাঁওতালদের মধ্যে বিয়ের সময় বরের হাতে জাঁতি আর কনের হাতে কাজরা উটি (কাজল লতা) থাকা বাধ্যতামূলক, যেমনটি বাঙালির বর কনের ক্ষেত্রে। গায়ে হলুদের প্রথা যেমন হিন্দু বাঙালির বিয়ের অঙ্গ, তেমনই মুণ্ডা সমাজে বরকনের গায়ে হলুদের প্রথা প্রাচীন এবং অবশ্য পালনীয়। বর ও কনের কাপড়ে যেমন গাঁটছড়ার রীতি মুন্ডা গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে বর্তমান, হিন্দু বাঙালির বিয়েতেও তাই। সিঁদুর দান, মেয়ের হাতে নোয়া পরানো মুণ্ডা সমাজে বিয়ের অন্যতম কৃত্য। এ সব বাঙালির বিয়েরও অঙ্গ। অর্থাৎ মুণ্ডা সমাজের বিবাহের লোকাচারের অনেক বৈশিষ্ট্যই মধ্য ও নিম্নবিত্ত বাঙালি আজও সযত্নে বহন করে চলেছে।

মুন্ডা সমাজের বিয়েতে ‘রায়বার’-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর ও কনে পক্ষের খবর আনা, তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ, পণ স্থির করা এবং পণের হস্তান্তর সব কাজই এই রায়বারের। এক সময় বাঙালির বিয়েতেও ঘটকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির ঘটক-প্রথা ‘রায়বার’-প্রথার অনুসরণ বলেই মনে হয়।

মৃত্যু সংক্রান্ত সংস্কারের ক্ষেত্রে মুণ্ডা (অষ্ট্রিক) গোষ্ঠির মানুষজন পরলোকে বিশ্বাসী। তাঁদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মা গাছ, পাহাড় বা কোনো পশুপক্ষীকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। সেই ধারণা থেকেই তাঁরা মৃত ব্যক্তির শয়্যাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে যাতে আত্মার বিশ্রামের কোনো অসুবিধা না হয়। এই বিশ্বাসই বাঙালি হিন্দুর পরলোকবাদ বা পুনর্জন্মবাদে রূপান্তরিত বলে নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন।^{২৫}

নদীতে মৃত ব্যক্তির অস্থি বিসর্জন, মৃত ব্যক্তিকে আহাৰ্য দানের প্রথা মুণ্ডা (অষ্ট্রিক) গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে আজও চলমান। সংস্কারের পর মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় বা নদিতে বিসর্জনের রীতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত। মুন্ডা গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে আহাৰ্য দেওয়ার প্রথা যেমন আছে তেমনই বাঙালি হিন্দু সমাজে শ্রাদ্ধাদি কর্মে অন্যতম কৃত্য মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান। বিভিন্ন দানের মধ্যে শয়্যাও অন্যতম। এই প্রথা মুণ্ডা (অষ্ট্রিক) গোষ্ঠি থেকেই এসেছে বলে মনে হয়।

সামাজিক রীতিনীতির পাশাপাশি যদি সমাজবন্ধনের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখা যাবে বঙ্গে যে পঞ্চায়েত প্রথা তাও মুণ্ডাগোষ্ঠির সমাজবন্ধনের অনুরূপ। মুণ্ডাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গ্রামসংঘের মতো এক সমাজবন্ধন অতি সুপ্রাচীন। শরৎচন্দ্র রায় তো মনে করেন, “পঞ্চায়েত প্রথা সম্ভবত ভারতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্তিত। পঞ্চায়েতকে ইহারা সত্যসত্যই ধর্মাধিকরণ জ্ঞানে মান্য করে। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্বে মুন্ডা সাক্ষী তাহার জাতিপ্রথা অনুসারে পঞ্চের নাম লইয়া এই বলিয়া শপথ করে ‘সিরমারে সিংবোঙ্গা ওতেরে পঞ্চ’, অর্থাৎ আকাশে সূর্যদেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়েত”।^{২৬} সমাজের পালপার্বন, বিবাহ যেমন সংঘটিত হয় এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, তেমনই সামাজিক বিরোধের মীমাংসার ভারও পঞ্চায়েতের। অপরাধের বিচার ও শাস্তিবিধান এই পঞ্চায়েতের হাতে। বাঙালির সমাজ সংগঠনেও একসময় পঞ্চায়েতের এমন ভূমিকাই ছিল।

আজ কোথায়

সূচনায় বিরোধময় হলেও আর্যায়নের প্রাথমিক স্তরে অনার্যদের আর্থ সমাজের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা যে হয়েছিল তা

আর্য-অনার্য মিশ্রণ থেকে বোঝা যায়। আবার এও ঠিক অনার্যদের সবাই আর্য প্রভুত্ব মেনে নেননি, আর্য সমাজের অঙ্গীভূতও হননি। এই সমস্ত মানুষ, যাদের অনার্য বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যারা নবাগত আর্যদের সঙ্গে মিশে না গিয়ে সক্রিয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করলেন তারা নিজ ভূমে হলেন পরবাসী। ছড়িয়ে পড়লেন তাঁরা বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে, প্রান্তরে। যে মানুষগুলো জঙ্গল সাফ করে, পাহাড় কেটে এ ভূমিকে বাসযোগ্য করে তুললেন, অনুর্বর মাটিকে চাষযোগ্য করলেন, তাদেরই আশ্রয় নিতে হল পাহাড়ে জঙ্গলে। চিহ্নিত হলেন উপজাতি, আদিবাসী, জনজাতি নামে। কেন্দ্র থেকে উৎখাত হয়ে পরিণত হলেন প্রান্তরজনে। দ্রাবিড় গোষ্ঠির যাঁরা তাঁরা আশ্রয় নিলেন মধ্যভারতের দক্ষিণাংশে, বিদ্যেচর আশেপাশে, মোঙ্গল গোষ্ঠির মানুষ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, আর মুন্ডা গোষ্ঠির মানুষ মধ্য ভারতের পূর্ব দিকে, ছোটনাগপুর মালভূমি ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে। এই মুণ্ডা গোষ্ঠির মানুষ যাঁরা পাহাড়, জঙ্গলকে আশ্রয় করে, এক সংহত জীবনের সন্ধানে আশ্রয় নিলেন বৃহদবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তদেশে তাঁদের সেই আশ্রয়টুকুও নিরংপদ্রব থাকেনি। সেই আদি যুগ থেকে, পরাধীন ভারতের ১৮৫৫-৫৬ থেকে, এমন কী স্বাধীন ভারতেও আজ পর্যন্ত এদের উৎখাত হতে হয়েছে বারবার। প্রসঙ্গত বলা রাখা বাঞ্ছনীয়, মুণ্ডা গোষ্ঠির মানুষ, যাঁদের আশ্রয় হল মধ্য ভারতের পূর্বাংশ, তাঁরা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত—সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, বিরহড়, অসুর, তুড়ি, খাড়িয়া, জুয়াং, শবর, পারেঙ্গা, গাদাবা, বোণ্ডা, ডিডেই, করওয়া, কোরকু, মওয়াসি প্রভৃতি।

সাঁওতালদের যেমন ছিল চায়চম্পা, চম্পাগাড় যেখানে ছিল তাঁদের আদি নিবাস, তাঁদের রাজ্যপাট, তেমনই এই মধ্য ভারতের পূর্বাংশে, ছোটনাগপুর মালভূমিকে কেন্দ্র করে, মুন্ডা গোষ্ঠির অন্যান্য আদিবাসীদেরও নিবাস ছিল। আইন-ই-আকবরী অনুসারে এই চম্পা দামোদর নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত, বর্ধমানের উত্তর-পশ্চিমাংশে বলে অনুমান করা হয়। বর্ধমানের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রাচীন বীরভূমের অবস্থান। যেহেতু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে এই চায়চম্পাকে স্মরণ করে এ কথা অনুমান করলে খুব ভুল হবে না তাঁরা এখানে সুখে স্বচ্ছন্দেই বসবাস করতো। এই স্বাচ্ছন্দ্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। বীরভূম এস্টেটের জমিদার তাঁদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে ১৭৯৯ থেকে ১৮১০ এর মধ্যে তাঁরা দামিন-ই-কো নামক এলাকায় বসতি গড়ে তোলেন, এলাকাটি পরে সাঁওতাল পরগণা নামে পরিচিত। জায়গাটি পাহাড়িয়াদের তৈরি করা ঔপনিবেশিক সরকারের একটি খাস এলাকা। চাষ আবাদের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করতে তাঁদের সেখানে সাদরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল, খাজনার বিনিময়ে বসতি স্থাপনের জন্য পাহাড়ের কোলে তাঁদের জমি দেওয়া হল। কিন্তু আদিবাসীদের জন্য এক নিশ্চিত নিজস্ব স্বদেশ তো হওয়ার নয়! সম্ভব ছিল না দিকুদের অত্যাচারের কারণে, বহিরাগতদের শোষণমূলক আচরণের কারণে। এক টুকরো জমি যখন তাঁদের কাছে জীবিকার উপাদান, ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্র এবং বাঙালিদের কাছে তা বিপন্নন যোগ্য সামগ্রী। তাই সেই ভূমি যখন জঙ্গলমুক্ত হল, জমিদার খাজনা বাড়িয়ে দিল, মহাজন চড়া হারে সুদ দাবি করল, সুদ মেটাতে না পারলে মহাজন জমির দখল নিল, তাঁদের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকে পরিণত করল। ব্যবসায়ীরা তাঁদের কাছ থেকে জিনিস কেনার সময় ওজন বেশি নিল, বিক্রির সময় কম দিতে শুরু করল। সরকার তাঁদের আবেদনে কর্ণপাত করল না, বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়া তো দূর অস্ত। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় জমিদার, মহাজন, সরকার সকলের যৌথ অত্যাচারের ফলশ্রুতি ১৮৫৫-৬০র সাঁওতাল বিদ্রোহ।

বিদ্রোহের পরে শুরু হল অকথ্য অত্যাচার, জমির অধিকার হাত ছাড়া হল, চাষবাস বন্ধ প্রায়, যেটুকু উৎপাদন সেটুকুও হস্তগত করল মহাজন। একদিকে বিদ্রোহের জন্য সরকারের আক্রোশ আর অত্যাচার, খাজনার জন্য জমিদারের

অত্যাচার, অন্যদিকে খাদ্যে টান। শুরু হল আকাল। তখন আর তাঁদের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। আর্যদের চাপে তাঁদের বৃহদবঙ্গের প্রান্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়া যদি প্রথম পরিযান হয়, এই প্রান্ত এলাকা থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়াকে দ্বিতীয় পরিযান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শুধু সাঁওতাল নয় মুণ্ডা গোষ্ঠির অন্যান্য সম্প্রদায়েরও একই ইতিহাস। ছোট ছোট অনেক মুন্ডা গোষ্ঠির মানুষ গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল, যাদের মধ্যে তুড়ি, অসুর, বিরহড়, জুয়াং, খাড়িয়া, করওয়া, মওয়াসি অন্যতম। “ছোটরাই দেশমাঙ্কিরেয়াক’ কাথা” সাঁওতালদের দ্বিতীয় পরিযানের এক সনিষ্ঠ দলিল। খাদ্যের অভাবে তাঁদের পতিত জমির সন্ধান সুদূর আসামের ধুবড়ি, গোয়ালপাড়ায়, কেরাপ সাহেব (L. O. Skrefsrud), Campbell সাহেবের সহায়তায়। বন্য পশুর আক্রমণকে উপেক্ষা করে, জঙ্গল সাফ করে, বসত গড়ে তোলার এক অসামান্য দলিল এই “ছোটরাই দেশমাঙ্কিরেয়াক’ কাথা”।^{২৭} এভাবেই গড়ে উঠল আসামে সাঁওতালদের বসতি। Carstairs-এর ‘Harma’s Village’ ও হল পরবর্তী সাঁওতালদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের এক জীবন্ত দলিল।^{২৮} মুণ্ডা, হো, শবর, খাড়িয়ারাও ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আর নির্দিষ্ট একটি মুণ্ডা আদিবাসীর বাস রইল না। এখানেই শেষ নয়।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা তাঁদের সঙ্গ ছাড়ে নি। খাদ্যে টান পড়লে বেঁচে থাকাটাই যখন বড় বালাই তখন ভিটের টান, শিকড়ের টান তো আকাশ কুসুম কল্পনা। যে মানুষ একদিন স্বদেশবোধে নিজস্ব বাসভূমি গড়ে তুলেছিল, ছিল চাষের জমি, ছিল যাদের ঠাকুরজিউর স্থান—পাহাড়, জঙ্গল, ছিল খোলামাঠে জাহের থান, সব কিছু ছেড়ে তাদের আশ্রয় খুঁজতে হল বনে জঙ্গলে, কিস্বা পরভূমে। এই পথ ধরেই বাঁচার তাগিদে তাঁদের তৃতীয় পরিযান ১৮৫৮য় আসামের নবগঠিত চা বাগানে, সেখানে সাঁওতালদের সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডা, খাড়িয়া, শবর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষও সামিল হল। নিজস্ব বসতি থেকে আশ্রয় হল চা বাগানের বস্তুতে, (বসতি থেকে উৎখাত হয়ে বস্তুতে আশ্রয় খুঁজতে হয় যখন, তখন তো শুধু পেটের দায়েই বেঁচে থাকা!) শুধু পেটের টানে, বেঁচে থাকার তাগিদে। বেঁচে থাকার লড়াই এখানেই শেষ নয়।

১৮৭২এ চতুর্থ পরিযান, উত্তরবঙ্গে চা বাগান গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। এই মুণ্ডা গোষ্ঠির মানুষ যাদের নিজস্ব ভূমি ছিল তারা পরিণত হল উৎপাদনের হাতিয়ারে, দলে দলে মুণ্ডা গোষ্ঠির আদিবাসীদের নিয়ে আসা হল চা বাগানে ‘আড় কাঠি’র মাধ্যমে। ছন্ন ছাড়া হওয়ার ইতিবৃত্ত এখানেই শেষ নয়। এল ১৯১২, বৃহদবঙ্গ ভাগ হল, বেহার আর উড়িষ্যা (এখনকার ওড়িশা) নিয়ে গড়ে উঠল আলাদা রাজ্য, বিহার। যাঁরা এতদিন কোনক্রমে সংঘবদ্ধ ভাবে বাস করছিল তাঁরা আর বিচ্ছিন্ন না হয়ে পারল না। একই গোষ্ঠির মানুষ, কেউ বঙ্গে, কেউ বা বিহারে। সংঘবদ্ধতার মানসিকতায় আবার এক পরিযান, বঙ্গ থেকে বিহারে বা বিহার থেকে বঙ্গে, খুব নিঃশব্দে, লক্ষ করল না কেউ। ইতিহাস বড় নির্মম, আবার বিহার ভাগ হল ১৯৩৬এ, গড়ে উঠল নতুন রাজ্য, উড়িষ্যা। আবার ছন্ন ছাড়া জীবন, আবার পরিযান। শেষ হল (জানি না এটাই শেষ কিনা!) ১৯৫৬য় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের ফতোয়ার হাত ধরে।

আজ ভারতীয় মানচিত্রে মুণ্ডা জনগোষ্ঠির যে অবস্থান তা ছোটনাগপুর মালভূমিকে অতিক্রম করে, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে থেকে সাতপুরা রেঞ্জ পর্যন্ত যেমন বিস্তৃত অন্যদিকে তেমনই উত্তরবঙ্গ থেকে আসামসহ অন্যান্য উত্তর-পূর্বের রাজ্যেও বিস্তৃত। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে মুণ্ডা জনগোষ্ঠির বিচ্ছিন্নতার চেহারাটা স্পষ্ট করা যেতে পারে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজন বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামে ছড়িয়ে আছেন (আসলে একমাত্র পুদুচেরি ও চণ্ডিগড় ছাড়া ভারতে এমন কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নেই যেখানে

মুণ্ডা, বিশেষত সাঁওতালদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।) মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ [যাঁদের ভাষা মুন্ডারি] বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং আসামে উপনিবিষ্ট। হো সম্প্রদায়ের মানুষ বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে। খাড়িয়া ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে। বিরহড় ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশায়। জুয়াং ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায়, অসুর, তুড়ি প্রায় নিশ্চিহ্ন। শবর পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায়। পারেক্সা ও গাদাবা ওড়িশা ও অন্ধ্র প্রদেশে, বোণ্ডা ও ডিডেই ওড়িশার দক্ষিণের শেষ প্রান্তে, কোরাপুট, মালকানগিরিতে। কোরকু, করওয়া, মওয়াসি মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্রে। বিচ্ছিন্নতার কারণে এঁদের কোনো কোনো সম্প্রদায় ভাষা হারিয়েছেন, হারিয়েছেন তাঁদের সংস্কৃতি। এদের মধ্যে অনেকেরই জনগণনায় স্থানই হয় না। মুণ্ডা গোষ্ঠির মানুষজন বিভিন্ন প্রশাসনিক এলাকায় বসতির কারণে কোথাও তাঁদের সংখ্যা বেশি, কোথাও বা কম। [আর ১৯৮১র জনগণনা থেকে ১০,০০০ নিচে যাঁদের সংখ্যা তাঁদের তো আর গণনার মধ্যে আনাই হয় না।] যেখানে তাঁদের সংখ্যা নগণ্য সেখানে সংখ্যাগুরু ভাষার চাপে তাঁরা ভাষা হারিয়েছেন, সংখ্যাগুরু ভাষাতেই তাঁদের ভাবের আদানপ্রদান। ফলত একই গোষ্ঠির মানুষ, কোথাও নিজেদের ভাষায় ভাবের আদানপ্রদান করেন, কোথাও বা অন্যের ভাষায়। পশ্চিমবঙ্গে বসত করা মুণ্ডা, খাড়িয়া, লোথা, শবর যখন ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায় তাঁরাই সংখ্যাধিক্যের জোরে নিজস্ব ভাষা বজায় রেখেছে। একই গোষ্ঠির মানুষের মধ্যে বিভাজন, সংখ্যাগুরু কাছে সংখ্যালঘু ব্রাত্য। দলগত সংহতি, সামাজিক সংহতি যে মুণ্ডা গোষ্ঠির মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সে সংহতি ভেঙে পড়েছে। সংখ্যার বিচারে যাঁরা নগণ্য তাঁদের সংখ্যা আরও কমছে। বোণ্ডাদের মধ্যে ভাষা বজায় রাখতে পেরেছেন তিন/চার হাজারের মতো মানুষ। ডিডেইদের মধ্যেও পাঁচ হাজারের মতো। পারেক্সাদের তো ওড়িশার পাহাড়-জঙ্গলে ও অন্ধ্রের প্রান্ত এলাকায় খুঁজতে হয়, তাঁরা প্রায় ভাষাহীন অবস্থায়। কোথাও তাঁরা দেশিয়া ভাষাকে আশ্রয় করেছেন, কোথাও তেলুগু। এদিকে অসুর আর তুড়িদের তো অস্তিত্বই প্রায় নেই। সাঁওতালদের মতো এক বড় সম্প্রদায়, ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে যাঁদের সংখ্যা ৭.৪ মিলিয়ন, তাঁদের মধ্যেও বিভেদ ভয়ংকর। ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী সাঁওতালদের চোখে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সাঁওতালরা নিচু স্তরের, হয়। ঝাড়খণ্ডের সাঁওতালদের কাছে তাঁদের ভাষা শ্রেষ্ঠ, পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালি ভাষা নিম্নমানের। সংস্কৃতিগত দিক থেকেও তাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরাই আদি সাঁওতাল সংস্কৃতির ধারক। পাহাড়বাসী মুণ্ডারা বিশ্বাস করেন সমতলবাসী মুণ্ডারা তাঁদের সম্প্রদায়ের থেকে আলাদা ভাষায়, সংস্কৃতিতে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা যে কত বড় অভিধাপ এ থেকেই তা বোঝা যায়।

ভারত সংস্কৃতি রচনায় যে গোষ্ঠির মানুষের অবদান অন্যতম তাদের আজ এই অবস্থা! ইতিহাসের কি পরিহাস! ২০০০এ মুণ্ডা জনগোষ্ঠির মানুষ ঝাড়খণ্ড নামে তাঁদের নিজেদের রাজ্য পেলেন বটে কিন্তু সেখানে তাঁরা কি সংখ্যাগুরু স্বীকৃতি পেলেন? আসলে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় তারা তো পঞ্চম তপসিলের অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যবস্থায় তাঁদের অন্য গোষ্ঠির মানুষের সঙ্গে সহবাসই নিয়তি সেখানে সংখ্যাগুরু হওয়ার যোগ্যতা তাদের কোথায়! বাঙালির মিশ্র সংস্কৃতিতে, ভারত সংস্কৃতির গঠনে তাদের যত বড় দানই থাকুক না কেন আদিবাসী তকমা তো তাদের গায়ে লাগানো আছে। আমাদের মতো দেশে ‘tribe’ আর কবে উচ্চাঙ্গ পেয়েছে? নিম্নবর্গেই তাদের অবস্থান, নিম্নবর্গের সঙ্গেই তাদের আত্মীয়তা, নিম্নবর্গের মানুষই তাঁদের স্বজন। Tribe বলে স্বীকৃতির মাধ্যমে যত সংরক্ষণই এদের জন্য থাকুক না কেন, মানুষ হিসেবে যে মর্যাদা এঁদের পাওয়ার কথা তা তারা পাননি, পাবেন বলেও মনে হয় না। সমাজের নিচের তলায়ই তাঁদের অবস্থান, সেখানেই তাঁদের পড়ে থাকাই নিয়তি। ‘আর্য্যামি’র মুখোশ পড়ে যদি একটা দেশের, একাধিক জনগোষ্ঠির ইতিহাস লেখা হয়,

‘আর্য্যামি’র আয়নায় যদি তাদের বিচার করা হয় তাহলে যা ঘটান কথা তাই ঘটেছে। বাঙালি জাতি যে একটা মিশ্র জাতি, তাদের ভাষাও মিশ্র, সংস্কৃতিও মিশ্র এই মানসিকতা থেকে বিচার করলে বাঙলার ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। অন্যান্য ‘অনার্য’ গোষ্ঠীর সঙ্গে মুন্ডা গোষ্ঠীর মানুষও অন্যভাবে বিবেচিত হতেন। এখানে সুনীতিকুমারের আক্ষেপ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য—“কুক্ষণে এদেশে বিলেত থেকে নোতুন ক’রে ‘আর্য্য’ শব্দের আমদানি হয়েছিল; মাক্স মুলারের লেখা পড়ে, আর নব্য হিন্দুয়ানির দলের বিজ্ঞানের আর ইতিহাসের বদহজমের ফলে, একটা নোতুন গৌড়ামি এসে আমাদের ঘাড়ে চেপেছে, সেটার নাম হচ্ছে ‘আর্য্যামি’। এই গৌড়ামি আমাদের দেশে নানা স্থানে নানা মূর্তি ধ’রেছে—স্বাধীন চিন্তার শত্রু এই বহুরূপী রাক্ষসকে নিপাত না ক’রলে ইতিহাস চর্চা বা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা—কোনটারই পথ নিরাপদ হয় না। এই গৌড়ামির মূল সূত্র হ’চ্ছে এই—

১। যা-কিছু ভালো তা প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে ছিল...

২। অতএব যা-কিছু খারাপ, সমস্তই আর্য্যের—‘অনার্য্য’...

৩। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্য, আমরা হিন্দু, এঁদের বংশধর; সুতরাং আমাদের মধ্যে অনার্য্য কিছুই নেই। যদি বা কিছু থাকে—সেসব কথা তোলা উচিত নয়...; আর্য্যামি যতদিন বাধা দিতে থাকবে, ততদিন বাঙলার ঠিক স্বরূপটি আমাদের বের করা কঠিন হবে”।^{১৬} ৩) আর অনার্য্য, বিশেষত মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর মানুষদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলাবে না, তাদের প্রতি আমাদের আচরণেরও পরিবর্তন ঘটবে না, বাঙলা ভাষায়, বাঙলা সংস্কৃতিতে মুণ্ডা উপাদানের প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় বাঙলা ভাষার, বাঙলার সংস্কৃতির মিশ্র চেহারাটি যতই প্রতীয়মান হোক না কেন।

এবার আমরা মুণ্ডা ভাষার স্বরূপ যা এত ওঠাপড়ার পরেও তারা বজায় রেখেছে, এবং অন্তত একটি ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্য উদ্ধার করে মুণ্ডা গোষ্ঠীর মানুষে মানস সম্পদের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাব।

মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার সংখ্যা অন্তত ২০টি যেগুলির মধ্যে অন্যতম সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, ভুমিজ, (তুড়ি), (কোডা), বিরহড়, (অসুর), (মাহলে), খাড়িয়া, জুয়াং, কোরকু, কোরাকু, (আগারিয়া), মওয়াসি, সোরা, গোরুম, রেমো, গতা’ এবং গুতব।^{১৭} এগুলির মধ্যে কয়েকটি ভাষা লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হলেও বাকি ভাষাগুলো আংশিকভাবে হলেও এখনও জীবন্ত। এই ভাষাগুলোর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। যেমন,

- ১। তিন বচনের অস্তিত্ব; গুতব, গোরুম, সোরা ছাড়া অন্যান্য মুণ্ডা ভাষায় দ্বিবচনের অস্তিত্ব।
- ২। ব্যক্তিবাচক সর্বনামের উত্তম পুরুষের দ্বি/বহুবচনে inclusive ও exclusive রূপের অস্তিত্ব। এক্ষেত্রেও গুতব, গোরুম, সোরা, জুয়াং ব্যতিক্রম।
- ৩। মধ্যসর্গের ব্যবহার; মূলের (root) সঙ্গে মধ্যসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ গঠন অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা সমূহের এক প্রাচীন বৈশিষ্ট্য, মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, রেমো, গতা’ প্রভৃতি ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য যত জীবন্ত অন্যান্য ভাষায় তা নয়। অন্যান্য ভাষার শব্দে মধ্যসর্গের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও তা অনুসন্ধিসূর দৃষ্টিতে প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের ফসিল মাত্র।
- ৪। লিঙ্গ ব্যাকরণের নিয়ম মেনে, সজীব-নির্জীব বিভাজন, animacy তাঁদের দর্শন নির্ভর; কোনো কোনো ভাষায় মনুষ্য-মনুষ্যের বিভাজন।
- ৫। অবরুদ্ধ ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব; কোনো ভাষায় checked consonant কোনো ভাষায় glottal stop.
- ৬। সাকর্মক ক্রিয়াপদে সজীব মুখ্য ও গৌণ কর্মের ব্যবহার (সংশ্লেষণ);

- ৭। ক্রিয়াপদে কর্তার সংক্ষিপ্ত রূপ।
- ৮। সম্বন্ধের চিহ্নে সজীব-নির্জীব পার্থক্য। পরসর্গের পাশাপাশি ত-পূর্বসর্গ যোগে possessive pronoun গঠন করার রীতি অন্তত উত্তর মুণ্ডা ভাষায়।^{৩১}
- ৯। নির্দেশক, জিজ্ঞাসাবোধক, অনির্দিষ্ট (সর্বনাম)এ সজীব-নির্জীবের পৃথক রূপ।
- ১০। নৈকট্যবাচক নির্দেশকের চার মাত্রা; সাধারণ, নির্দিষ্ট, দৃষ্টি-নির্ভর নির্দেশক, শ্রবণ-নির্ভর নির্দেশক।
- ১১। সকর্মক ও অকর্মকে কালবাচক চিহ্নে পৃথক রূপ।

বৈশিষ্ট্যগুলি সব ভাষার ক্ষেত্রে একইভাবে ক্রিয়াশীল না হলেও বেশির ভাগ ভাষাতেই বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ মুণ্ডা ভাষা লোকসাহিত্যে সমৃদ্ধ। তবে সাঁওতালি ভাষা কি লোকসাহিত্যে কি স্বচেষ্ঠায় লিখিত সাহিত্যে যেমন সমৃদ্ধ অন্য ভাষা তেমন নয়।। সাঁওতালি ভাষার লোকসাহিত্য সংকলনের সূচনা উনিশ শতকের মধ্যভাগে, মিশনারিদের (বিশেষত J. Phillips) হাত ধরে, ১৮৪৫ সালে। সংগৃহীত হয়েছে, ছড়া, ধাঁধা, লোকগান, প্রবাদ, লোককথা। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত রেভারেণ্ড এল. ও. স্ক্রেফস্‌ডের ‘হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াক’ কাথা’ Traditions and Institutions of the Santals (সাঁওতাল গুরু কোলেয়ান কথিত) আর ১৯২৫ থেকে ১৯২৯এর মধ্যে প্রকাশিত P.O. Bodding ‘Santal Folktales’, ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত F.T. Cole-এর Santali Riddles বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘হড়কোরেন মারে হাপড়ামকোরৈয়াক’ কাথা’ যেমন সাঁওতালদের উৎস ঐতিহ্য, শ্রুতি আর কিংবদন্তির দলিল তেমনই ছোটরায় দেশমাঝি কথিত ও রায় সোরেন লিখিত, P.O. Bodding সম্পাদিত ১৯১৭ সালে প্রকাশিত ‘ছোটরায় দেশমাঝিরৈয়াক’ কাথা’ সাঁওতালদের মধ্যভারতের পূর্বাংশ, বৃহদবঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিযানের দলিল।

স্বচেষ্ঠায় লিখিত সাহিত্যের সূচনা উনিশ শতকের শেষভাগে, সম্ভবত ১৮৯৪-৫ সালে (১৯০০ সালে প্রকাশিত) লিখিত সাধু রামদাস টুডুর ‘সাঁওতাল বংশাক’ ধরম পুথি’। সাধু রামদাসের উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের দিকে নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে বহিরাগতদের প্রভাবে সাঁওতাল সমাজ ধ্বংস না হয়ে যায়। (খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরীত হওয়া থেকে বিরত করা) গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সুনীতিকুমার যোগ ছিল। সুনীতিকুমারের নিজের ভাষায় লেখক ও গ্রন্থটির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা জানা যায়, “Subsequently, through the interest of Sri Bankimchandra Chakravorty, Manager of the Dhalbhum Raj, Ramdas Tudu.....was persuaded to come to Calcutta and meet me. He had his unique collection as a precious possession with him. It was beautifully written in Bengali script, and it was all bound in leather, showing his very love for the work. There were pictures in the book which were all drawn by him. The second edition of this work has since appeared from the Dhalbhum Raj Estate Office.....”^{৩২}

বিশ শতকের সাঁওতালি সাহিত্যের তিনটি ধারা—

- ১) নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের ঐতিহ্যের অনুসন্ধান কবিতা, যাত্রাপালার (নাটক) মাধ্যমে;
- ২) কবিতার পাশাপাশি উপন্যাস, গল্প, নাটককে উন্নত সাহিত্যিক সংরূপ হিসেবে গড়ে তোলা; আর
- ৩। বাঙলা এবং ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদ।

সাধুরামচাঁদ মূর্মু সাঁওতালি সাহিত্যে ‘কবিগুরু’ বলে আখ্যাত। ‘ঠার’ বলে যে ভাষাকে ব্যঙ্গ করা হত, এবং এখনও বোধহয় হয়, সেই “ভাষার কবিতাকে যে ছন্দে লালিত করা যায়, ভাব-ভাষা ও কাঠামোগত দিক দিয়ে আধুনিকতা ছোঁয়া যায়”^{৩৩} তার স্বাক্ষর তাঁর কবিতায়। ‘সংসার ফেঁদ’ নাটক তাঁর আর এক অনবদ্য সৃষ্টি। পণ্ডিত রঘুনাথ মূর্মুর ‘বিদুচাঁদান’, ‘দাড়েগা ধন’ (শক্তিই সম্পদ), ‘খেরওয়াড় বির’, ‘সিদু-কানছ ছল’-এ সাঁওতাল ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো। এই পর্বের অন্যান্য লেখক বাবু বেঞ্জামিন সোরেন, মঙ্গলচন্দ্র সোরেন (জমসিম বিনতি), স্টিফেন মূর্মু প্রমুখ।

সামাজিক অবক্ষয় ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা থেকে কথাসাহিত্যের সূচনা। কথাসাহিত্যের অন্যতম সংরূপ উপন্যাস লেখা হলেও তা উন্নত পর্যায়ের সংরূপ হিসেবে গড়ে ওঠেনি। তবে তা উন্নত সংরূপ হিসেবে গড়ে না উঠলেও উপন্যাস লেখার চেষ্টা অস্বীকার করার নয়। ডমন হাঁসদার ‘আতো ওড়াক’ (ডাইনবিদ্যা, জনগুরু প্রতি বিশ্বাস), বাদল হেন্সমের ‘শোভা কুকমু’ (বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবাদের সমস্যা), নুনকু সোরেনের ‘মুহিলা চেচেৎ দাই’ (খ্রিস্টান মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদের কাহিনি), সময় কিস্কুর ‘রতন’ (প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গড়ে ওঠে ছোটগল্প। ছোটগল্পের সূচনা হৃদয়নাথ মণ্ডলের ‘বাপুরিচ’কিন’ (দুই হতভাগা) গল্প প্রকাশের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে। দারিদ্র্য, শোষণ, অবিচার, কুসংস্কার, সামাজিক অসাম্য ও বৈষম্যকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে ছোটগল্পের বিষয়। আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা, মদ্যপানের ক্ষতিকর পরিণাম, ত্রিকোণ প্রেম ও তাঁর সমস্যা, সামাজিক স্থলন ও কুসংস্কার, গ্রামের মোড়লের ষড়যন্ত্র, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, দ্বিতীয় পক্ষ পরিগ্রহে সমাজের প্রতিক্রিয়া, বিবাহবিচ্ছেদ জনিত সমস্যা, বিচারের নামে প্রহসন, সমাজে শ্রেণি বিভাজন সব কিছুই বিষয় হয়ে উঠেছে ছোটগল্পের। প্রদীপকুমার হাঁসদার ‘সাধ’ (কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ), বিজয় টুডুর ‘দসার পাহটা’ (মনস্তাত্ত্বিক গল্প, অবচেতন মনের ক্রিয়া), উপেন কিস্কুর ‘শিখনাত’, কৃষ্ণকুমার মূর্মুর ‘রানি’, দুর্গা মূর্মুর ‘আনাট’ (সংকট), বিশাখা মাঝির ‘পাচরি’ (প্রাচীর) (কুষ্ঠরোগ ও রোগীর প্রতি ঘৃণা), পূরবী মূর্মুর ‘কাইডি দ অকয়’ (কুষ্ঠ রোগীর সমাজ থেকে বিতাড়ন), অনাদিচরন হেন্সমের ‘তাড়াম গাড়ে’ (দ্বিতীয় স্ত্রী পরিগ্রহের কাহিনি), স্নেহলতা মাণ্ডির ‘দাক’ ল ঘাটরে’ (অসম প্রেমের কাহিনি), পার্বতি মূর্মুর ‘মানমি’ (সমাজে মহিলার মর্যাদার লড়াই) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সাহিত্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক মহিলা সাহিত্যিকের আবির্ভাব।

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ১৯৩৬-৩৮এ ‘পেড়াহড়’ পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস ‘বাহা ডালওয়া’, বাঙলা ‘ফুলের সাজি’র অনুবাদ, অনুবাদক পস্টার কিস্কু। ১৯৪৬-এ Carstairs-এর ‘Harma’s Village’-এর অনুবাদ ‘হারমাওয়াক’ আতো’, অনুবাদক রুবেন রুসেন কিস্কু রাপাজ, ‘গীতাজুলি’র অনুবাদ ‘সেরেও সেপেও’, গল্পগুচ্ছের অনুবাদ ‘গাম গাহলে’ (সুহৃদকুমার ভৌমিক), রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র কবিতাগুচ্ছের অনুবাদ ‘বিলিং বিলিং’ (সুধীরকুমার মিত্র), জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’-এর অনুবাদ (অমৃত হাঁসদা) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধ ছাড়াও কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রকাশিত হচ্ছে। ১৮৯০ সালে ‘হড় হপনরেন পেড়াহড়’ পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাঁওতালি পত্রিকা-সাহিত্যের যে সূচনা হয়েছিল আজ সেই পত্রিকা-সাহিত্য মহীরূহে পরিণত।

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে মুন্ডা গোষ্ঠীর মানুষজন খুবই নগণ্য হলেও কয়েকটি সম্প্রদায়ের, যেমন, সাঁওতাল, মুণ্ডা (যাঁদের ভাষা মুণ্ডারি), হো, খাড়িয়া, কোরকু এবং শবর, জনসংখ্যা লক্ষাধিক। ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী সাঁওতাল

সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৭৩,৬৮,১৯২, মুণ্ডাদের সংখ্যা ১১,২৮,২২৮, হো ১৪,২১,৪১৮, কোরকু ৭,২৭,১৩৩, খাড়িয়া ২,৯৭,৬১৪, শবর ৪,০৯,৫৪৯।^{৭৪} কৃষি এবং শিল্পে শ্রমের বিনিময়ে এদের যে অবদান তা অস্বীকার করার নয়। পরিযান বন্ধ হলেও মৌসুমি পরিযান (seasonal migration) থেমে নেই। এক একটা চাষের সময় অসংখ্য মানুষ পুর্ব বা নামাল খাটতে বেরিয়ে পড়েন রোজগারের আশায়। আবার পুর্বের মানুষকেও শ্রমিকের সন্ধানে তাঁদের দ্বারস্থ হতে হয়। তাঁদের শ্রম ছাড়া চালকলের কাজ চলে না। রাস্তা, সেতু ইত্যাদি আধুনিক ভারতের পরিকাঠামো গড়ে তোলার যন্ত্রণা তাঁরাই। তবুও মানব সম্পদ হয়ে ওঠার যোগ্যতা তাঁদের নেই। শিক্ষার হার নগণ্য। যে সমস্ত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা লক্ষাধিক তাঁদের শিশুদের পঠনপাঠনের ব্যবস্থাও মাতৃভাষার মাধ্যমে করা হয় নি। যাঁদের জন্য করা হয়েছে, যেমন, সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে সাঁওতাল শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা, তাও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। সাঁওতাল ছাড়া অন্য ভাষাভাষীর জন্য আদৌ কোনও ব্যবস্থা হয়েছে কিনা জানা নেই। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সাঁওতাল ছাড়া অন্যান্য মুণ্ডা গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠনের যে কোনও ব্যবস্থা হয়নি তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। পরিকাঠামোর দিক থেকে যেটুকু ব্যবস্থা আছে তা তাঁদের ক্ষেত্রে কতটা উপযুক্ত, বা আদৌ উপযুক্ত কিনা তার বিচার হয়নি। স্কুল আছে, শিক্ষক নেই। শিক্ষক যদি বা থাকেন তাঁদের আদিবাসী ছাত্রদের পাঠ দানের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকে না। B. K. Panda আদিবাসী এলাকায় শিক্ষার সমস্যা নিয়ে যা লিখেছিলেন তা মুণ্ডা গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য, “The problem lies in the methods of teaching such children with different language background as well as switching over from communication through oral tradition to that of a tradition which has a different language, and reading in the different language, then writing which is a new skill they learn, and unaware of the rote learning practices. The language in such a context becomes a barrier for learning. The teaching in the schools does not take into consideration the importance of the native language as well as the process of transforming the child who has come with an oral learning tradition to that of the skills of reading, writing and speaking a different language, and most of the words which they do not understand and are being used in their text books. It is like learning blindly without comprehending what is being taught. When the language is not clear the learning also takes place in a vacuum, i.e., as such no effective learning takes place in the classroom.

The paradox is that the schools are there and teachers do teach, but ultimately who learns? And if at all everyone learns - the question is "what is being learnt"? "Is it the unidirectional monotonous learning, the biggest question to think about"? The problem is more pronounced in the schools serving heterogeneous tribal communities with different languages. "Are the teachers in a position to teach in all the tribal languages present in these schools"?^{৭৫} সব থেকে বড় সমস্যা, প্রথম প্রজন্মের ছাত্রদের যে শ্রদ্ধা ও মানবিক আবেদন নিয়ে পাঠদানের কথা তা অধিকাংশ শিক্ষকের ক্ষেত্রেই থাকে না। জোর করে এক অজানা ভাষার মাধ্যমে পড়াতে গিয়ে প্রকৃত শিক্ষা তো হয়ই না, মানব সম্পদ হিসেবে তাদের গড়ে তোলাও যায় না। এ ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে লিপির ব্যবহার এক বড় সমস্যা। কয়েকটি ভাষার, যেমন সাঁওতালি, হো, শবর, নিজস্ব লিপি থাকলেও সেই লিপির ব্যবহার নিয়েও তাঁদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ আছে। সাঁওতালি লিপি অলচিকি-র উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতালদের মধ্যে অলচিকি লিপির প্রতি এক বিরূপ মনোভাব থাকার কারণে সে রাজ্যে লেখা, পড়া, পাঠ্যপুস্তক সবই রোমান বা

দেবনাগরি হরফে, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িয়ায় অলচিকি লিপির ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ আছে। এই দুই রাজ্যে বাংলা বা ওড়িয়া এবং রোমান লিপির ব্যবহার থাকলেও অলচিকি-র বিরোধিতা নেই। ফলত একই গোষ্ঠির মানুষ একই ভাষা লিখছেন পৃথক ভাবে। পশ্চিমবঙ্গ বা ওড়িয়ায় অলচিকি লিপিতে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তা ঝাড়খন্ডের সাঁওতালদের কাছে পাঠযোগ্য নয়। আবার ঝাড়খন্ডে রোমান বা দেবনাগরি লিপিতে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে লিপি বিরোধিতার কারণে পশ্চিমবঙ্গ বা ওড়িয়ায় পাঠযোগ্য নয়। বিচ্ছিন্নতা যে কত বড় অভিশাপ তা এই লিপি বিরোধিতা থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয় এই স্ববিরোধিতাকে হাতিয়ার করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারও তৎপরতা দেখায় না। এই টানাপড়েনে বলি হন পড়ুয়ারা। অলচিকি লিপির মাধ্যমে সাঁওতালি ভাষার পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্য রচনার কিছুটা অগ্রগতি হলেও হো লিপির ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতিই হয়নি। আর পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শবর লিপির ব্যবহারের চিত্রটি বর্তমান লেখকের জানা নেই।

আমরা বঙ্গদেশ গড়ে ওঠা, বঙ্গদেশে আর্যায়নের ইতিহাস আলোচনা করে অনার্য, বিশেষত মুন্ডা জনগোষ্ঠির অবদানের যে চেহারা লক্ষ করেছিলাম, কালের নিয়মে তথাকথিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তা ভুলে বসেছি বা সচেতনভাবে ভোলার চেষ্টা করেছি এবং আজও করে চলেছি। যত দিন না আমরা আর্য খোলস ছাড়তে পারব, আদিবাসী তথা মুণ্ডা গোষ্ঠির মানুষও যে আমাদের মতোই বৃহদবঙ্গের অধিবাসী এ কথা স্বীকার করতে পারব ততদিন এঁদের সমাজের এক কোণে তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে পড়ে থাকতে হবে, ইতিহাস যাই বলুক না কেন!

সূত্রনির্দেশ :

- ১। Suniti Kumar Chatterji, 1979. The Origin and Development of the Bengali Language. Calcutta : Rupa & Co. P. 40. "The non-Aryans, Dravidians and Kōl, fought with the Aryans, both Vedic and non-Vedic, and made peace with them. ...But from the advent and settlement of the Aryans, large numbers of non-Aryans were finding a place in Aryan society, either as serfs and slaves, or as free cultivators and labourers and artisans, although they were looked down upon as << Śūdras >> by the Aryan settlers, the << Viśas >>."
- ২। তদেব। পৃ.৪৭।
- ৩। চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার। ১৯৭৪। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অষ্টম সংস্করণ। পৃ.৩৭।
- ৪। প্রাচীন পালি সাহিত্যে বুদ্ধের সময়ের ষোলটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, ভাজ্জি, মল্ল, ছেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার এবং কাম্বোজ।
- ৫। Chatterji, Suniti Kumar. 1979. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫।
- ৬। তদেব পৃ ৭৯।
- ৭। চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার। ১৯৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭-৮।
- ৮। তদেব, পৃ ৩৮।
- ৯। রায়, নীহাররঞ্জন। ১৯৮০। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব। কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। প্রথম সাক্ষরতা সংস্করণ। পৃ ৪৯।
- ১০। Journal of the Asiatic Society of Bengal, NS. Vol. XXIII, pp.301-33.
- ১১। দ্র. R. C. Majumdar (Ed.), 1943. History of Bengal, Vol. I, Hindu period. p.558.

- ১২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ১৯৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ ৩।
- ১৩। তদেব, পৃ ৩২-৩।
- ১৪। তদেব, পৃ ৪০।
- ১৫। Chatterji, Suniti Kumar. 1960. Indo-Aryan and Hindi. Second edition. Calcutta: Firma KLM. Pp. 37-8.
- ১৬। Przyluski, Jean. 1975. Non-Aryan Loans in Indo-Aryan. In: Sylvan Levi, Jean Przyluski and Jules Bloch, Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India. (Tr. By Prabodh Chandra Bagchi). University of Calcutta. Pp.29-30.
- ১৭। রায়, নীহাররঞ্জন। ১৯৮০। প্রাগুক্ত, পৃ।
- ১৮। Suniti Kumar Chatterji and P. C. Bagchi. 1975. Some more Austric words in Indo-Aryan. In: Sylvan Levi, Jean Przyluski and Jules Bloch, Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India. Pp. xxi-xxix.
- ১৯। Sylvan Levi. 1975. Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India. In: Sylvan Levi, Jean Przyluski and Jules Bloch, Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India. P. 95.
- ২০। শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ। ১৯৯৮। বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স। পৃ ৫৩।
- ২১। Chatterji, Suniti Kumar. 1945. Buddhist Survivals in Bengal. B. C. Law vol. Part I. P. 78.
- ২২। রায়, নীহাররঞ্জন। ১৯৮০। প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬।
- ২৩। তদেব।
- ২৪। Chatterji, Suniti Kumar. 1969. প্রাগুক্ত. পৃ ৩৪।
- ২৫। রায়, নীহাররঞ্জন। ১৯৮০। প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫।
- ২৬। রায়, শরৎচন্দ্র। ১৩৪৫। ভারতবর্ষের মানব ও মানবসমাজ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫।
- ২৭। সরেন, রায়। ১৯১৭। ছোটরায় দেশমাঙ্কিরেয়াক' কাথা। বেনাগাড়িয়া : মিশন প্রেস।
- ২৮। Carstairs, Robert. 1935. Harma's Village. Pokhuria : Santal Mission Press. উপন্যাসটি রুবেন রুসেন কিস্কু রাপাজ ১৯৪৬ সালে 'হারমাওয়ারক' আতো' নামে সাঁওতালিতে অনুবাদ ও প্রকাশ করেন।
- ২৯। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ১৩৮২/১৯৭৫। বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে। কলিকাতা : জিজ্ঞাসা। পৃ ৩।
- ৩০। বন্ধনীর মধ্যে রাখা ভাষাগুলি লুপ্তপ্রায়।
- ৩১। সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, বিরহড় উত্তর মুণ্ডা শাখার অন্যতম ভাষা।
- ৩২। Chatterji, Suniti Kumar. 1961. Foreword to Hoṛ Bapla Puthi, Paḥil Haṭin' by Stephen H. Murmu. Benagaria : Mission Press.
- ৩৩। হেমব্রম, পরিমল। ২০০৭। সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস। কলিকাতা : নির্মল বুক এজেন্সি। পৃ ১৫৭।
- ৩৪। Census of India, 2011. PAPER 1 of 2018 LANGUAGE. INDIA, STATES AND UNION TERRITORIES (Table C-16). Office of THE REGISTRAR GENERAL, India.
- ৩৫। Panda, B. K. 2012. 'Transaction of Teaching Learning Process for the Tribal Children Mother Tongue as the Key for Development.' Adivasi, 52:1-2. pp. 1-8.

পরিশিষ্ট ১

২০১১ জনগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী কয়েকটি মুণ্ডা ভাষাভাষীর স

সাঁওতালি	৭৩,৬৮,১৯২
মুন্ডারি	১১,২৮,২২৮
হো	১৪,২১,৪১৮
কোরকু	৭,২৭,১৩৩
করওয়া	২৮,৪৫৩
কোডা/কোড়া	৪৭,২৬৮
খাড়িয়া	২,৯৭,৬১৪
জুয়াং	৩০,৩৭৮
গুতোব/গাদাবা	৪০,৯৭৬
শবর/সোরা	৪,০৯,৫৪

পরিশিষ্ট ২

মুণ্ডা গোষ্ঠীর কয়েকটি সম্প্রদায়ের প্রতি দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাসের চিত্র (২০১১ জনগণনা)

সম্প্রদায়	১৯৭১-৮১	১৯৮১-৯৯	১৯৯১-২০০১	২০০১-২০১১
সাঁওতাল	১৪.৪১	২০.৪০	২৪.০৩	১৩.৮৯
গাদাবা	৩০.২৫	০.৪৭	-৬.৭৩	৫৬.০৩
হো	৪.২৫	২১.১৮	৯.৮৫	৩৬.৩২
জুয়াং	৫৬.৪১	-১১.৪৫	৪০.৬৩	২৮.১৩
খাড়িয়া	১১.০৭	৬.০৯	৬.২৩	২৪.২১
কোরকু	১৩.০৮	৩৪.০৬	২৩.২৬	২৬.৫৭
করওয়া	২১৮.৪৭	-৪২.৮৩	২৫.৮৪	-১৭.৭৩
মুন্ডা	-৩.৭০	১৫.৯৭	২৩.২২	৬.৩০
শবর	-৫.৮২	৩০.৬৪	-৭.৫৬	৬২.১৯

Bio Profile of the Author

Assistant Professor in Ethnolinguistics, Netaji Institute for Asian Studies, Kolkata.

Reader/ Associate Professor of Bengali, The University of Burdwan.

Professor of Bengali, The University of Burdwan.

ICCR Tagore Chair, Centre for Modern Indian Studies. Georg-August University. Göttingen, Germany. Fellowship: Visiting Scientist and Fellow, Department of Linguistics. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany in 2006, 2007 and 2010.

Visited National Bibliotheket, Oslo, Norway to work on P. O. Bodding's archival documents.

Retired from the University of Burdwan. 2017.